আসুরী

সুপর্ণা চ্যাটার্জী ঘোষাল

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

ভূমিকা

'ভূমিকা' শব্দটুকু লিখে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। এরপরে কী লিখব? কী লিখতে হয়? নিজের লেখা প্রথম মৌলিক উপন্যাস— এর ভূমিকা লিখতে গেলে যে সমস্ত শব্দ উপচে পড়বে, তাতে আবেগের স্রোত বড্ড বেশি থাকবে। আবার খুব নিরপেক্ষভাবে গুটিকয় কথা বলে চলে যাব, তাও সম্ভব নয়। মধ্যমপন্থাই অবলম্বন করি বরং।

এক কিশোরী আর তিন নারীর গল্প বলতে গিয়ে, বইয়ের নাম 'আসুরী' কেন দিলাম, 'দেবী' কেন নয়?

দেবীদের গল্প তো লেখা হচ্ছেই! যাঁরা আলোর দিকে নিজেদের মেলে ধরেন, প্রতিনিয়ত তাঁরা কতজনের আদর্শ হয়ে উঠছেন। কিন্তু, এক নারী তার সম্পূর্ণ জীবনাবর্তে কতবার যে আসুরী হয়ে ওঠে, তার ইয়ত্তা নেই। যারা মনের ভিতর ব্যাসিলিস্ককে পুষে রাখে, তার পিছনেও তো কোনো না কোনো কারণ রয়েছে! কেউ সেই কারণ খোঁজার জন্য, তাদের মনের অতলে ডুবুরি নামিয়ে দেখার চেষ্টা করে না। শুধু যে বিষাক্ত নীল বলয় তাদের ঘিরে রাখে, সেটুকু দিয়ে বিচার করেই পেনের নিব ভেঙে দেয়। মর্মবেদনা বোঝে কয়জন?

সুমির গল্প না বললে এ জীবনে মুক্তি ছিল না। দায়বদ্ধতা বলেও একটা কথা হয়। ঋণের বোঝা কিছুটা লাঘব হল। গাঢ় লবণাক্ত স্বেদবিন্দুর মতো এই গল্পের পুরো শরীর জুড়ে যে সমস্ত গোপন কথা ছড়িয়ে ছিল, তারা এবার শান্তির নিঃশ্বাস নিক। মিলিয়ে আসুক নখের আঁচড়-রেখা। কানাগলি থেকে সৈকতে ফিরে যাক পুরোনো স্মৃতিচিহ্নেরা।

বন্ধুদের ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে নেই শুনেছি। কিন্তু আমার বন্ধুভাগ্য বরাবরের ভালো। সারাজীবনে এমন বহু বন্ধুকে পাশে পেয়েছি, যাঁরা না থাকলে, আমার এই অস্তিত্বই থাকত না। মনীষ মুখোপাধ্যায়, আমার প্রাণের বন্ধু আলিভাই এই উপন্যাস লিখিয়ে নেওয়ার নাটের গুরু। আলিভাই, ব্রডওয়ে লিভার ফ্রাই ডিউ আছে কিন্তু!

নীলাদ্রি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম আলাপেই যেভাবে সখ্য গড়ে উঠল, তাতে

আশা রাখব, আমাদের বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবে।

তিন্নি, শান্তনু, সুফিন— এদের তিনজনের কাছে যে-হারে ঋণের বোঝা বাড়িয়ে চললাম, তা এক জীবনে কেন, সাত জীবনেও শোধ করতে পারব না। দিনে চারবার আমার কাছে আড্ডা দিতে এসে, লেখা বন্ধ করিয়ে, তিন্নি জিজ্ঞেস করে গিয়েছে, 'লেখা কদ্দুর?'

সেমিমাদি, কবি সেমিমা হাকিম, এবং রূপদি, লেখক মৌসুমী ভৌমিক, এই উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকে, প্রত্যেকটা অধ্যায় পড়ে নির্দ্বিধায় ভালো-মন্দ রায় দিয়েছেন। পরামর্শ দিয়েছেন। এই উপন্যাসের যা কিছু ভালো, সব এঁদের প্রাপ্য। খারাপটুকুর দায়, আমি মাথা পেতে নিচ্ছি।

অরিন্দম, সিসিফাসের মতো এই জগদ্দল পাথরটাকে বারবার ঠেলে তোলার যে দুঃসাধ্য কর্মটি করে গিয়েছ, তার জন্য কীভাবে ঋণশোধ করব বলো দেখি? জেনো, ভালোবাসি।

ধন্যবাদ আমার অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষীদের। আমার মতো অযোগ্য মানুষকেও তাঁরা শর্তহীন ভালোবাসায় ঢেকে রেখেছেন।

শেষ করার আগে, হে পাঠক, আপনার হাতে তুলে দিলাম প্রতিটা চরিত্রকে। খেলা শেষে, যেভাবে গ্রাম্য বালক কুড়িয়ে নেয় তার নীল-সবুজ কাচের গুলি, দেশলাই খোলের মার্কা; যেভাবে শো শেষে ম্যাজিশিয়ান আবার তার পোষা পায়রাকে টুপি থেকে বের করে মাথার নরম পালকে হাত বুলিয়ে দেয়; যেভাবে শীতের শুরুতে, ময়ূরাক্ষীর বুকে উড়ে আসে পরিযায়ী হাঁসের দল— সেভাবেই এই উপন্যাসকে বুকের মধ্যে স্থান দেবেন।

এটুকুই আশা রইল।

সুপর্ণা

।।১।।

"রুনু আমাদের বউ হিসাবে খুব ভালো। হ্যাঁ, খানিক গায়ের রঙ ময়লা বটে, তবে মনটো কিন্তু খুব সাদা।" চোঁয়া ঢেকুর তুলে, ছোট ঠাকুরঝি মুখের ভিতর আরও এক গ্রাস তেল মাখানো মুড়ি ছুড়ে দেয়। "দেখো না বউদিদি, ওই লেগেই তো আমরা উখে অ্যাত্তো ভালোবাসি। অভাবের সংসার, আবার কষ্ট করে উনুনে আঁচটো দিবে, তাই বলি, 'ওরে রুনু, লে, লে আর খাটবি ক্যানে, ওই তো চারটি পারা রুটি, ও তু আমাদের সথেই করে লিস।'"

এতদূর দাক্ষিণ্য দেখাতে পেরে, কৃষ্ণা মুখুজ্জের মেচেতা পড়া মাঝবয়সী মুখে তদগত ভাব জেগে উঠল।

এই সংসারে সকালের অফিস-কাছারি-ইস্কুলের কোনো তাড়া নেই। বেলা দশটার দিকেও তাই দিব্যি রান্নাঘরের দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে আড্ডা জমিয়েছে কৃষ্ণা মুখুজ্জে, টিঙ্কার মা আর রুনু। টিঙ্কার মা নিজের গায়ের ঘামাচিগুলো পুচুক পুচুক করে মারছে, আর মাঝে মাঝে মুড়ি তুলে মুখে ভরে চিবুচ্ছে আয়েশ করে। গ্রীষ্মের দাবদাহ এই আম গাছের ছায়ায় অনেক সহনীয়। বাতাসে কচি আমের গন্ধ। টগরফুলের বাগানে ভ্রমরের আনাগোনা। একটু পরে আরও অনেকেই গুটি-গুটি পায়ে এই বাড়িতে এসে জুটবে। আদা দেওয়া লাল চা, নাকি ম্যাক্সির তলা থেকে উপচে আসা কৃষ্ণা মুখুজ্জের ভারী বুকের আকর্ষণ— কোনটা অতিথিদের বেশি টানে, সবাই তা জানে। মুখের সামনে বলার সাহস কেউ পায় না।

আসলে রুনু তাদের এই আড্ডার অংশ নয়। কোনোদিনই হয়ে ওঠেনি। এই বাড়িতে সবাই যে তাকে কোন জায়গায় রেখেছে, কোন চোখে দেখে, তা রুনু ভালোভাবেই জানে। কিন্তু পেট বড় বালাই। তাও আবার এক একটা নয়, মুখ বুজে তিনটে পেটের কথা রুনুকে ভাবতে হয়। যে ওর কথা ভাবে না, তার পেটের কথাও না ভেবে রুনু পারে না। এখন তো আবার আরও একটা লোক বাড়তে চলল সংসারে। ভয়ে এখনও কাউকে জানাতে পারেনি।

ছোড়দি আলুপোস্ত চাপাবে, হাঁক দিয়েছিল, তাই আলুগুলো কেটে দিতে এসেছে রুনু। যদি রান্না শেষ হলে ছোট বাটির একবাটি আলুপোস্ত পাওয়া যায়, তাহলে এইবেলার চিন্তা আর করতে হবে না। মা-মেয়েতে যা হোক করে চালিয়ে

নেবে। ওর নিজের সংসারে আজও আলু সেদ্ধ আর ফ্যানা ভাত। খেয়ে খেয়ে সুমির পেটে চড়া পড়ে যায়, জানে। তবু মেয়েটা এত লক্ষ্মী, কিছুতেই রা কাড়ে না। উঠোনে বঁটি পেতে, গাছের ছায়ায় গুচ্ছের আলু নিয়ে বসে ডুমো ডুমো করে কাটছিল, ছোড়দির মুখে নিজের প্রশংসার কথা শুনে, ম্লান মুখটা তুলে সামান্য হাসে রুনু।

"দেখেছ বউদিদি, রুনুর গালেও কেমন টোল পড়ে! লাও, আর খানিক পারা মুড়ি লাও!"

টিঙ্কার মায়ের আঁচলে এক মুঠো মুড়ির সঙ্গে একটুকরো মুলোও দিয়ে দেয় কৃষ্ণা মুখুজ্জে।

"তু তা'লে আলু গুলান কেটে লে, তারপর মুড়ি খাবি, হোক?"

রুনু জবাব দেয় না। একটা পচা আলুর অর্ধেকটা কেটে বাদ দিতে দিতে মাথা নাড়ে খালি। ভালোই জানে, কাজ না সেরে দিলে ছোড়দির হাত গলে এক খাবলা মুড়ি অবধি নামবে না।

সকালের কাজকর্ম সেরে টিঙ্কার মা একবার এই মুখুজ্জে বাড়িতে ঢুঁ মারতে আসে। আসার সময় কোঁচড়ে ভরে কখনও গুটিকয় কুমড়ো ফুল, ক'টা হাঁসের ডিম, মাঠ থেকে ধরে আনা ছোট ছোট কাঁকড়ার তেঁতুল দিয়ে টক— যখন যেমন পারে, আনে। অবস্থা পড়ে গেলেও, মুখুজ্জেদের আইবুড়ো দুই বোনের যা আছে, তা এই পাড়ার হতদরিদ্র লোকের তুলনায় অনেক। তাদের তোয়াজ করে চললে, ছিটেফোঁটা যে করুণা পাওয়া যায়, তা পাড়ায় মানুষগুলোর মোটামুটি সবারই জানা। করুণা করার থেকে, দেখানোতেই এই দুই বোনের বেশি সুখ। তার সুযোগ নিতে টিঙ্কার মা ছাড়ে না। টিঙ্কার বাবা আজই বাড়ির চালা থেকে টাটকা কুমড়ো নামিয়েছে। টুকটুকে হলুদ কুমড়োর এক ফালি নিয়ে এসেছে টিঙ্কার মা।

সদর দরজা দিয়ে বাঁ হাতে ঢুকেই মুখুজ্জেদের বিশাল বড় উঠোন। দুটো বড় বড় আমগাছের তলায়, উঠোনের মাঝখানে খোড়ো মাটির চারচালা বাড়ি, ওটা রান্না ঘর। রান্নাঘরের বাঁ দিকে, উঠোনের এক পাশে চারটে বড়সড়ো ঘর। চুন-সুরকির মোটা মোটা দেওয়াল। বহুকাল আগে পেস্তা-রঙে ছোপানো হলেও এখন সে রঙকে আতস কাচ দিয়ে খুঁজতে হয়। বাড়ির লোকজনের বক্তব্য, এককালে নাকি এরা জমিদার ছিল। সে জমিদারির ছিটেফোঁটাও এ বাড়ির আনাচে-কানাচে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবুও, এ বাড়ির প্রত্যেকের কথাবার্তায় সারাক্ষণই একটা দেখনদারি লেগেই থাকে।

থাকার মধ্যে সদর দরজার ডানদিকে ঘুরে যে ছোট উঠোন, তার দুই দিকে গোয়ালের ভেঙে পড়া অংশ। আর একটা মাটির হামার ঘর। জমিদারির

সাক্ষ্যবাহী এটুকু নিদর্শনকে সম্বল করেই কথার ফেনা গেঁজিয়ে ওঠে। বাড়ির নোনাধরা দেওয়ালে ধাক্কা মেরে, ঘুরপাক খায়। রাতের বেলা, সদর দরজার উপর ঝোলানো হলদে বাল্বটা নিভে যাওয়ার আগে অবধি, এই বাড়ির লোকেরা সেই কথা-ঘূর্ণির মধ্যে মানস ভ্রমণ করে। ডুব দেয়, আবার ওঠে। এর ব্যত্যয় হয় না। আ-শীত-গ্রীষ্ম তারা শূন্যগর্ভ কথার কল্প-মর্মর প্রাসাদ গড়ে। যে যার মতো স্তম্ভ তোলে, দরজা-জানলা বসায়। ঝরোখা জুড়ে দেয়। মিনার বানায়, তাতে বসায় বহুমূল্য রত্ন। এই নির্মাণের শেষ নেই।

বাস্তবের মাটিতে পা দিলে দেখা যায়, এই পুরো বাড়ি সাপখোপ আর বিছের আস্তানা। বড় উঠোনের একদিকে বেল, অশোক, মুসুম্বির গাছ। তার পিছনে খিড়কি দুয়ার। দুয়ারের বাইরে বহুদূর ছড়ানো বাঁশ, ঘেঁটু আর মানকচুর ঘন বন। তার এক পাশে বৈরাগীদের আখড়া। রথের সময় টিনের ছোট রথ বের হয়, জন্মাষ্টমীতে হ্যাজাগ জ্বেলে চলে অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন। খোল-করতালের আওয়াজে বাঁশবনের অন্ধকার ছিঁড়ে যায়। ওই ক'টা দিন, বাঁশবনের বুকের মাঝখান দিয়ে যে রাস্তা চলে গিয়েছে পাকা সরানের দিকে, সেই রাস্তা দিয়ে যেতে ভয় লাগে না। 'হরে কৃষ্ণ' রবে পুরো গ্রাম ভেসে যায়। বাঁশবনের মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় বুকে থুতু ছিটিয়ে 'রাম, রাম' জপার দরকার পড়ে না কারোর। বাকি সারা বছর টিমটিমে লণ্ঠন জ্বেলে সচ্চিদানন্দ আর তার রোগে ভোগা হাড় জিরজিরে বউ মায়া, চৈতন্য আর রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি আগলে পড়ে থাকে।

বেলগাছের কাছে চৌকো একটুকরো জমি। বাথরুমের পিছনের দেওয়াল আর বাউন্ডারি দেওয়ালের ফলে, বছরের কোনো সময়তেই সেখানে রোদ পড়ে না। একটুকরো ঘাস গজাতেও কেউ কখনও দেখেনি ওই জমিতে। গুল ভর্তি কাঠের বাক্স, কয়লার বস্তা, কাঠের চ্যালা রাখা থাকে সেখানে। তার সামনে শান বাঁধানো কুয়োতলা। কুয়োতলা লাগোয়া হাত চারেক চওড়া একটা বাথরুম। কুয়োর পাশেই মাটির ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘরে দক্ষিণাকালীর দারুমূর্তি। এই পুরো অংশটা মুখার্জী পরিবারের চার অবিবাহিত ভাইবোন গঙ্গা, কৃষ্ণা, অরুণ, অশোক আর তাদের অশীতিপর বাবা দুর্গাপদ মুখুজ্জের।

উঠোনের পিছন দিকে, যেখান দিয়ে কুয়োতলায় কাঁচা নর্মদা বেরিয়ে গিয়ে পড়ছে সামনের পানা-পুকুরে, সেখানে দুটো ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে অমিত আর রুনুর সংসারের জন্য। মাটির একটেরে দোতলা বাড়ি। হরিণ মার্কা দেশলাইয়ের বাক্সকে লম্বালম্বি দাঁড় করিয়ে দিলে এই বাড়িটার মতো দেখাবে। নিচের তলায় ঘুরঘুট্টি অন্ধকার মতো একটা রান্নাঘর। সেই ঘরে একটা জানলা রাস্তার দিকে খোলে বলে বরাবর পাল্লা বন্ধ রাখার হুকুম করেছে অমিত। রান্নাঘরের গা

বেয়ে মাটির উঁচু উঁচু সিঁড়ি। ভাঙা, এবড়ো-খেবড়ো। নিত্যদিন গোবর দিয়ে না লেপলে ধুলোয় ভরে যায়। উপরে উঠে গেলে একটা ছোট ঘর। ঘরের মেঝের খানিকটা অংশ বসে গিয়েছে। ইঁদুরের দৌরাত্ম্যে সেখানে একদিন একটাকার কয়েন কুড়িয়ে পেয়েছিল রুনু। তার পর থেকে, গোবর লেপার সময় খুব আশায় আশায় বুক বেঁধে থাকে ও। যদি ভুল করে আরও বড় কোনো গুপ্তধনের দেখা পেয়ে যায়! একটা সোনার কানের দুল, না হোক নাকছাবিই সই! ইঁদুরগুলো ভুল করেও তো এনে রাখতে পারে।

মায়ের একটা শাড়ি দিয়ে অশোক গাছে দোলনা বানিয়েছে সুমি। এখন সেটায় বসে দুলতে দুলতে ছোট পিসি আর টিঙ্কার মায়ের দিক তাকিয়েছিল। মায়ের সুখ্যাতি করার সময়, মা যেই ছোটপিসির মুখের দিকে তাকায় না, অমনি ছোটপিসি ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসে। সুমির নজর এড়ায় না। এই সময়গুলোতে সুমির খুব রাগ হয়। কেন মা ওদের বাড়িতে এসে কাজ করে দেবে? নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না? এমনিতে সারাদিন কোমর-হাত-পায়ের ব্যথায় ভুগছে। রাতে ঘুমের মধ্যেই ছটফট করে।

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় মা'কে অনেকবার এই প্রশ্ন করেছে সুমি, "যাবে না পিসিদের ঘরে। ডান দুটো তোমাকে দিয়ে বেশি বেশি কাজ করায়। আমার ভাল্লাগে না।"

মা ওকে নিজের আরও কাছে টেনে নিয়ে চুলে পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়, "ডান তো বটেই। কী করব বল, লোকের বাড়িতে ঝি-গিরি করতে গেলে দুটো পয়সা আসত। বামুনের বাড়ির বউকে কেউ কাজেও রাখবে না, আর জমিদার বাড়ির বউরা কারো বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতেও যায় না, বুঝেছিস? তার চে' এই ব্যবস্থাই ভালো। কেউ কিছুই জানতে পারছে না।"

সুমি মায়ের কাছ থেকে ছিটকে সরে যায় মশারির দেওয়াল ঘেঁষে। মশারির গায়ে যত্রতত্র ফুটো। মশা ঢুকে, অনবরত পিনপিনে একটানা শব্দ করে চলে।

চিলেকোঠায় চামচিকি আর পায়রাদের রাজত্ব। মাঝে মাঝে, বৃষ্টিধারার মতো, ঝুড়মুড়িয়ে চামচিকির নাদি ওদের ঘরের মধ্যে পড়ে। তাই পুরো সিলিং জুড়ে একটা কমলা ত্রিপল সাঁটা। সেখান থেকে চামচিকিদের ঝটাপটির আওয়াজ ভেসে আসে। ঘরের মধ্যে চামচিকির চিমসে গন্ধ।

অন্ধকারে হাত চালিয়ে আন্দাজেই মশা মারে সুমি। "হুঁহ! জানতে আবার পারে না। জানো, কলতলাতে লোকেরা কী বলাবলি করে তোমাকে নিয়ে? সেদিন খাবার জলের বোতল ভরতে গেছিলাম, কলতলায় পদ্মা কাকিমা আর সন্ধ্যা জেঠুমা দাঁড়িয়েছিল। আমি পিছন দিয়ে গেলাম বলে, আমাকে দেখতে পায়নি। ওরা বলছিল, 'অমিতের বউয়ের যেমন ডাঁট, তেমনি মুখে নুড়ো জ্বলে। ভাতারের

সুখও পায় না, ভাসুরের গা টিপতে হয়, আবার বড়দিদের বাড়িতে ঝি খেটে মরে।' তারপর গা টেপাটিপি করে হাসছিল।" বলতে বলতে সুমির গা চিড়বিড় করে ওঠে।

ইস্কুল থেকে হেঁটে বাড়ি ফেরার সময়, বন্ধুরা যখন পঞ্চাশ পয়সার জল আইসক্রিম খায়, অথচ সুমির কাছে সেটুকুও থাকে না; যখন নিউ ইয়ারে সবাই কী সুন্দর লাল টুকটুকে গোলাপের ছবি-ওয়ালা গ্রিটিংস কার্ড পায়, সুমিকে কেউ দেয় না— তখন সেই কাঠফাটা রোদে আর রাগে যেমন মাথা জ্বালা করে, তার চেয়েও ঢের বেশি গরম লাগে। এই সময় কিছু একটা লণ্ডভণ্ড করে দিতে ইচ্ছা করে। এমন কিছু, যাতে সবার খুব খুব ক্ষতি হয়ে যাবে।

সেই জন্য তো সেবার নতুন বছরের কার্ড দেওয়া-নেওয়ার দিন সবাই যখন প্রেয়ার লাইনে গিয়েছিল, সুমি প্রত্যেকের ব্যাগ থেকে কার্ড বের করে, একে একে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ক্লাস ঘরে ছড়িয়ে দেয়। ক্লাসের একটা মেয়ে দেরি করে ব্যাগ রাখতে ঢুকেছিল। সেই মেয়েই ঘটনাটা দেখে ফেলে। বড়দিমণি গার্জেন কল করতে ছাড়েননি, "বাবাকে এনে কাল আমার অফিসে দেখা করবে।"

সুমি জানত, বাবাকে যদি বলে, তাহলে বাবা মেরে ফাটিয়ে দেবে। তিনদিন জ্বরের অজুহাত দিয়ে তাই আর স্কুলই যায়নি ও।

সুমি অনেক কিছু আঁচ করতে পারে। কী আঁচ করতে পারে, কেন পারে— সেটা যদিও ওর কাছে স্পষ্ট নয়, তবে মনের ভিতর থেকে কেউ একটা ইশারা পাঠায়। যে পরিবেশে ও বড় হয়ে উঠছে, তাতে লোকজনের মন বুঝে না চললে টিকতে পারবে না, সেটাও ওর জানা। জানে, কখন কী করা উচিত। কিন্তু ওই যে, সারাক্ষণ মাথায় আগুন জ্বলে। ভূগোল বইতে পড়েছে আগ্নেয়গিরির ভিতরে গরম লাভা থাকে, নিজের ভিতরেও সেই লাভাকে খুব টের পায় ও। বেরিয়ে আসার জন্য মুখিয়েই রয়েছে। আলতো টোকা দিলেই আশেপাশের সব পুড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে।

সেই ভিতরের ইশারা থেকেই বুঝেছে, ক্লাস ফোরের এসব হাবিজাবি জিনিস নিয়ে বেশিদিন অবধি মাথা ঘামাবে না বড়দিমণি। ঘামানওনি। চার দিনের দিন যখন স্কুল গেল, তখন ক্লাসের মেয়েরাই চেপে ধরেছিল ওকে, "কী রে ছোটলোক, ভয়ে স্কুল এলি না যে? বাবাকে এনেছিস?"

সুমি অবলীলায় মাথা নাড়ে। মিথ্যা বলতে ওর একটুও অসুবিধা হয় না। বাড়িতেই রোজ দেখে, অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

"বাবা এসেছে। বড়দিমণি কথা বলছে, আমাকে অফিসঘরে ঢুকতে দিল না।" বলে, টেবিলের উপর থেকে টপ করে আধখানা চক ভেঙে ব্যাগে ভরে নিল ও। বাড়িতে চক নিয়ে যাওয়ার নেশা ক্লাসের সব মেয়েরই আছে। কিন্তু সুমি নিয়ে যায় অন্য কারণে।

বাড়িতে সব জানলা দরজায় আলকাতরা দিয়ে কালো রঙ করা। সেই সব দরজায় ও চক দিয়ে লিখে বেড়ায়। ক্লাসে বিজ্ঞান নিতে এসে মৌসুমী দিদিমণি যেভাবে মিষ্টি হেসে সালোকসংশ্লেষ পড়ান; দরজার গায়ে চক দিয়ে গাছ আঁকার সময়, ও সেভাবেই হাসি হাসি মুখ করে রাখে। মনে মনে নিজেকে মৌসুমী দিদিমণি বলেই ডাকে। কল্পনায় নিজের সামনে দেখতে পায় ছাত্রীদের বিনুনি করা মাথার সারি। কেউ ভুল উত্তর দিলে রাগ হয়, কেউ 'ছোটলোক' বলে টিটকিরি কাটলে মনে মনেই তার গালে ঠাস ঠাস বসিয়ে দেয় থাপ্পড়। লাভা বেরিয়ে আসতে চায়। গামছা দিয়ে বানানো লম্বা চুল, একটানে হ্যাঁচকা মেরে খুলে ফেলে। গোলচে ঝোপওয়ালা দরজার গাছটাকে হাতের তালু দিয়ে মুছে ফেলে খসখস। তারপর ছোটপিসি যেভাবে সুন্দর গন্ধওয়ালা স্নো-পাউডার মাখে, সেভাবে পুরো মুখে চকের সাদা ধুলো মেখে নেয়। নিজেকে ভাবে রবিনা ট্যান্ডন। না, না, মত বদল ঘটায় নিজেই— 'তেরা করুঁ দিন গিন গিন কে...' মাধুরী ভাবাই ভালো। তবু মাথা ঠান্ডা হয় না।

এই যেমন এখন ছোট পিসির মুখ বেঁকিয়ে হাসা দেখে সুমির গা-পিত্তি চটে গেল। উঠোনে, চটের বস্তা পেতে রেশনের চাল মেলা ছিল। সাঁৎ করে দোলনা থেকে নেমে, সটান চালের উপর দিয়ে ছুট দিল সুমি। মুহূর্তের মধ্যে নিকানো উঠোনে চালের ছড়াছড়ি। মা হাঁ হাঁ করে উঠে আসার আগেই ছোটপিসি দৌড়ে আসে। পায়রা তাড়ানোর জন্য সরু কঞ্চির আগায় ফালি ফালি কাপড়ের টুকরো বেঁধে রাখা ছিল চালের পাশেই। কৃষ্ণা মুখুজ্জে সেই কঞ্চি তুলে নিয়েই তাড়া করে সুমির পিছনে। কতদূর যাবে! নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকে যাওয়ার আগেই কঞ্চির আগা ছুঁয়ে ফেলে সুমির পিঠ। সপাং সপাং শব্দ ওঠে চারবার। সঙ্গে কৃষ্ণা মুখুজ্জের কথার ফোয়ারা, "মাংমারানি, খুব কুটকুটি লয়! দেখাইছি মজা।" আবার সপাং সপাং।

রুনু বঁটি ফেলেই ছুটে আসে। সুমিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে, ছোট ঠাকুরঝির দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়ায়।

"ছোড়দি, মেরো না গো। মেয়েটা মরে যাবে একদিন।" রুনুর গলা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

"মারব না মানে? চাল কি তুর বাবা দেবে? গরু-গাড়ি করে চাল এনেছিলি বিয়ের সময়? ভিকিরি মাগী! ছাড় বলছি, ছাড়!" কঞ্চির কয়েকটা বাড়ি রুনুর রংচটা ব্লাউজ আর কালচে পিঠেও পড়ে।

সুমির নিজের গায়ের আঘাত গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মায়ের গায়ে আঁচড়টুকুও সহ্য করতে পারে না। মনে মনে মা কালীর নামে দিব্যি কাটে, বড় হলে সবাইকে একহাত দেখে নেবে।

রুনু কাঁদতে কাঁদতে সুমিকে নিয়ে ঘরে ঢুকে শিকল তুলে দেয়।

বাইরে থেকে কৃষ্ণা মুখুজ্জের হুংকার ভেসে এল, "অমিত আসুক কোট থেকে। দেখি তুদের মা-বিটির লাফানি-ঝাঁপানি কত থাকে।"

রুনু ঘরের ভিতরে বসেই কেঁপে ওঠে। কপালে কি ভগবান একদিনও শান্তি দেবে না! রুনু জানে, অমিত এলেই ছোড়দির অভিযোগের প্যাঁটরা খুলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তিল থেকে তাল, অমিতের কানে বিষ উগড়ে দিয়ে তবে চুপ করবে ছোড়দি। তারপর অমিত বেলতলা থেকে চ্যালা কাঠ এনে, রুমুর পিঠেই ভাঙবে। আর, দুই ঠাকুরঝি মিলে কাপড় তুলে নাচতে নাচতে ইন্ধন জুগিয়ে যাবে।

নিজের পেটে হাত বোলায় রুনু। ঠাকুর, পেটেরটা যেন ছেলে হয়। ছেলে বড় হলে, ছেলের সঙ্গে চলে যাবে তার কাজের জায়গায়। এদের থেকে অনেক দূরে। আর, সুমিকে একটা ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দিতে পারলেই শান্তি।

এখন থেকেই পাড়ার, বে-পাড়ার, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে অনুষ্ঠানে গেলে সুমির জন্য ছেলে দেখে রুনু। কার বাবার চাষ-জমি আছে, শহরে দোকান আছে বড়। কয়েকটা বছর পরে মাধ্যমিক দিয়ে দিলেই কারোর সঙ্গে জুটিয়ে দেবে। এদের দুই বোনের মতো ধিঙ্গি বয়স অবধি তার সুমি যেন আইবুড়ো বসে না থাকে। মনে মনে দক্ষিণা কালীর কাছে একবেলা উপোস করার মানত করে। এই মানতের একটা সুবিধা আছে। রাতটা রুনুর প্রায় না খেয়েই কাটে। সুমির খাঁই বড় বড় বেশি। এই কাঠি চেহারায় রাক্ষসীর মতো পিণ্ডি গেলে মেয়েটা। রাতেরবেলা নিজের খাবারটা সুমির মুখে তুলে দিতেই চলে যায়। পেটের ছেলেটা কোনো পুষ্টিই পাচ্ছে না।

এতক্ষণ সুমিকে জড়িয়ে ধরেই বসেছিল রুনু। আচমকা তাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। উঠে দাঁড়ায় সন্ত্রস্তভাবে। তারপর দরজার শিকল খুলে বেরিয়ে আসে বাকি আলুগুলো কাটতে।

।।২।।

"ঘুরতে যাবি সুমি? যা দৌড়ে গিয়ে জামা পরে আয়।"

তক্তার উপরে বসে, ছোটকা তবলায় আলতো চাঁটি মারছে। পাশে কাঠের গিটারটা রাখা। খয়েরি গিটারটার উপরে সুমির একটুও লোভ নেই। কিন্তু স্ট্যান্ডের উপর তোলা লাল রঙের ইলেক্ট্রিক গিটারটার উপরে ওর খুব লোভ। ঠাকুরের প্রসাদের থালায় ফল কেটে সাজানোর পরে, মাঝখানে যেমন একটুকরো লাল টুকটুকে চেরি দেয়, গিটারটা ঠিক ওইরকম দেখতে। ছোটকা বলেছে, বড় হয়ে গেলে ওটায় হাত দিতে দেবে। ছোটকা যখন গিটারটা বাজায়, পুরো বাড়ি আনন্দে ঝমঝম করে ওঠে। খরবায়ু বয় বেগে বাজালে তো, সুমি স্পষ্ট দেখতে

পায় হু হু করে বাতাস দিচ্ছে, আর ও দু'দিকে দু'হাত ছড়িয়ে একটা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। আনন্দে ও হাততালি দেয়, পাক ঘুরে ঘুরে ছোটকার ঘরে নাচ করে। কিন্তু, এই একটা জিনিসেই ছোটকা হাত দিতে দেয় না। নইলে ছোটকার ঘরের এমন কোনো জিনিস নেই যা সুমি অবাধে নাড়াচাড়া করে না। চানাচুরের কৌটো, ওজন মেশিন, হোমিওপ্যাথির জাবদা বই।

ছোটকার ঘর থেকে সারাক্ষণ একটা ঠান্ডা ঠান্ডা গন্ধ ওঠে। ঠিক যেমন শান্তি এই ঘরের কালচে সিমেন্টের মেঝেতে পিঠ পেতে শুলে পাওয়া যায়।

সুমি বিড়ালের মতো চকচকে চোখে গিটারের দিকে তাকিয়েছিল। ছোটকার কথা শুনতে পায়নি।

ছোটকা এক দাবড়ানি দিল সুমিকে, "যাবি না তো? বেশ আমি একাই চললাম। ফেরার পথে সবিতা আইসক্রিম খেয়ে আসব। একা একাই।"

বলে তবলা ফেলে রেখে ছোটকা সত্যিই দরজার পিছনে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রাখা বাটিকের ফতুয়াটা মাথায় গলিয়ে নিল।

সুমি স্প্রিং-দেওয়া পুতুলের মতো ছিটকে উঠে, মুহূর্তের মধ্যে জামা পরে হাজির। ছোটকার সাইকেলের সামনের রডে বসে যাওয়ার যে কী মজা। মনে হয় যেন ট্রেনে চেপেছে। সুমি মনে মনে জানে, ট্রেনে চাপলে নিশ্চয়ই এর থেকে বেশি মজা লাগবে না। একদিন ঠিক ট্রেনে, এরোপ্লেনে আর জাহাজে চাপবে। যখন খুব বড়লোক বাড়ির বউ হয়ে যাবে, তখন।

সুমিদের পাড়া পেরিয়ে বাগদি পাড়া। দু'পাশে সার দিয়ে খোড়ো-বাড়ি। দরমার বেড়া। দরজার সামনে চটের বস্তা ঝোলানো। বাড়ির সামনের একফালি জায়গায় ছাগল বাঁধা। এককোণে হাঁসের ঘর। চালের মধ্যে লাউ-কুমড়ো-কুঁদরির লতা এলিয়ে থাকে অলস দুপুরের মতো। বাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে লম্বা লাল কাঁকড়-মাটির রাস্তা। বাগদিপাড়া শেষ হলে রাস্তার দু'দিকে জোড়া-পুকুর। ফি বছর ওই পুকুর দুটোয় সাদা পদ্মের চাষ করে চাষাপাড়ার নিখিল। ছোটকার বন্ধু।

ছোটকা সাইকেল দাঁড় করায় উঁচু পুকুর পাড়ে।

"গুনে বল ক'টা ফুল দেখছিস?"

সুমি গুনতে শুরু করে, "এক, দুই, তিন..."

পঁচিশ-ছাব্বিশের কাছাকাছি গিয়ে ছোটকা সুমির ঝুঁটি ধরে টান দেয়, "ওই ফুলটা আগে গুনেছিলি তো, আবার কেন গুনছিস?"

"না!" সুমি জেদি গলায় চেঁচায়, "ওই শুকনো পাতার পাশেরটা গুনিইনি। পানকৌড়িটা যেখানে বসেছিল, ওটা গুনেছি।"

পুকুরের মধ্যে আঝোড়া বাঁশ পড়ে থাকে, আধডোবা হয়ে। তার কঞ্চির

উপরে, দু'পাশে টানটান করে ডানা ছড়িয়ে, পানকৌড়িরা ডানার জল শুকায়। একটা ছোট মাছরাঙা বহুক্ষণ ধরে জলের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। সুমির গলার শব্দে চমকে উঠে উড়ে গিয়ে, আরও দূরে, মাথা তুলে থাকা একটা শুকনো পদ্মের টাঁটির উপর গিয়ে বসে। উড়ে যাওয়ার সময় আওয়াজ করে, 'কিলিকিলি।'

ডাক শুনে পাখি চিনতে শিখেছে সুমি। সব ডাক চেনে না অবশ্য। তবে ওদের আম গাছে যখন কাঠঠোকরা ডাকে, তখন চিনতে পারে। কাঠঠোকরা ডাকলে মনে হয়, কেউ যেন মেঝেতে একটাকার মোটা কয়েন ফেলে দিল গায়ের জোরে। আর কয়েনটা মাটিতে আছাড় খেয়েই ঘুরতে ঘুরতে পড়ে গেল। নির্জন দুপুরে ছোট বসন্তবৌরি ডাকে, 'কুপ... কুপ... কুপ!'

"ছোটকা, লাল পানকৌড়ি! ঐ দেখো, ডুবে গেল!" সুমি পুকুরের এক দিকে আঙুল তুলে দেখায়। লাল মাথাওয়ালা একটা পানকৌড়ি ও দেখতে পেয়েছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ডুবে গেল ওটা, ছোটকাকে আর দেখানোই গেল না।

ছোটকা বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সেদিকে। অনেকদূরে গিয়ে পাখিটা আবার মাথা তুলল। ছোটকা হেসে ওঠে, "আর ধুর খেপি, পানকৌড়ি কোথায়, ওটা তো ডুবুরি হাঁস। খুব তাড়াতাড়ি ডুব দিতে পারে। কত ছোট সাইজ দেখেছিস? আর এমন খয়েরি রঙের পানকৌড়ি হয়? চ', আবার পরে দেখবি।"

ফুল গোনা আর শেষ হয় না সুমির। ছোটকা সাইকেলে চেপে গান ধরে "এই আনন্দযজ্ঞে সবার..."

আনন্দযজ্ঞ কীভাবে করে, সুমি জানে না। কিন্তু গানটা শুনতে ভালো লাগে। পুকুরের উপর থেকে বয়ে আসা মেঠো হাওয়ায় জলজ শ্যাওলার ঘ্রাণ মিশে যায়। সুমির চুল ওড়ে। পানকৌড়ির মতো দু'পাশে দু'হাত ছড়িয়ে সুমি সেই হাওয়া মাখে। মুখে, চুলে, মনের ভিতরে।

পুকুরের পরে বিঘার পর বিঘা, রাস্তার দু'পাশে ধেনো জমি। এক এক মরসুমে এক এক রকম দেখতে। রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে অর্জুন, কুল, আর জারুলের গাছ। যেতে যেতে একটা কালভার্টও পড়ে। চাষের জমির দিকে ক্যানেলের জল চলে যায়। এখানে ছোট ছোট কাঁকড়া ধরে ডোমেদের বাচ্চারা। আর রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে যায় অনেকদূর।

রাস্তার শেষ সীমায় আদানবুড়ো শিবতলা। শাল, মহুয়া আর জামগাছের জঙ্গলের মাঝে, পোড়ামাটির ভাঙাচোরা মন্দির। সারা বছর অবহেলায় পড়ে থাকে। কুকুর আসে, শিবলিঙ্গের মাথায় নিজের নিশানা ছেড়ে রাখে। শুকিয়ে গেলে শিবের শরীর দুর্গন্ধে ভরে যায়। বামুনপাড়া সেবাইত আসে সেই সকালবেলায়। ঠাকুরকে সাফসুতরো করে মাথায় বেলপাতা আর ধুতরো রেখে 'ধ্যায়েনিত্যং' বলার আগে অবধি, দেবতা অসহায়ের মতো পড়ে থাকে। স্বীকৃতি